

বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ চাষে সাফল্য

ড.রশিদ করিম

দেশীয় মাছ প্রাণিজ পুষ্টির প্রধান উৎস। দেশীয় মাছ অন্য মাছের তুলনায় অনেক সুস্বাদু। এ সব মাছের চাহিদা সব সময় বেশি থাকে। কিন্তু অতি আহরণ এবং জলজ বিপর্যয়সহ নানাবিধ কারণে আমাদের অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তপ্রায়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য নিরসন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে। গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন আমাদের জলাশয়গুলোকে ভরাট করে ফেলেছে। যার ফলে দেশীয় মাছের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। এ ছাড়াও ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যেয়ে অপ্রয়োজনীয় কীটনাশকের যত্রতত্র ব্যবহারের ফলে দেশীয় মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলো অনেক প্রজাতির দেশীয় মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যা আর আমাদের গ্রামের হাটবাজারে দেখা যায় না।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের মিঠাপানির মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনেকগুলো মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে। গ্রামীণ জনপদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় স্বল্প ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত কম শ্রম নির্ভর এবং পরিবেশ উপযোগী অধিক ফলনশীল সুস্বাদু উন্নত জাতের মাছ চাষের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভাবিত এ সকল প্রযুক্তি প্রান্তিক পর্যায়ের অগ্রসরমান চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদেরকে নানারকম প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে হাতেকলমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের মৎস্য চাষিরা মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ত্ত করে দেশীয় মিঠাপানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। জলজ পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি বিবেচনায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫ টি কেন্দ্র এবং ৫ টি উপকেন্দ্র থেকে পরিচিতি হয়ে থাকে। এগুলো হলো স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। এছাড়াও উপকেন্দ্র ৫ টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাজশাহী, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সাত্তাহার, বগুড়া, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর, নদী উপকেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে এ পর্যন্ত মোট ৭৫ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। আইইউসিএন ২০১৫ সালে তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়। এসব মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৩৭ প্রজাতির দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। গত এক যুগে দেশীয় মাছের উৎপাদন কম বেশি চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এসব মাছের প্রাপ্যতা সম্প্রতিককালে অপেক্ষাকৃত অন্যান্য বছরের চেয়ে বাজারে বেশি দেখা যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট গত এক বছরের মধ্যে দারকিনা, কাকিলা, শোল, তিতপুঁটি, নারকেলি, চেলা, ঢেলা, রাগী, বাতাসী, রয়না ও বাটিয়া পুঁটিয়া ইত্যাদি মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে।

মিঠাপানির দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় যেসব মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে তাদের মধ্যে শোল মাছ অন্যতম। আমাদের দেশে এই সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন মাছটি খুব জনপ্রিয় হওয়ার এর চাহিদাও প্রচুর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মাছটি মুরেল, জিওল ও স্নেকহেড নামে পরিচিত। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে শোল (*Channa striata*) মাছের পোনা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে এ মাছের প্রজনন মৌসুমে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডিম দিলেও গ্রীষ্মকালে বেশি ডিম দেয়। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় মাছটি এখন প্রান্তিক পর্যায়ের চাষিদের চাষের আওতায় চলে আসবে। কাকিলা (*Xenentodon cancila*) মাছটি এক সময় আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। কিন্তু জলবায়ুর প্রভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মানুষসৃষ্ট নানা কারণে বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতা ব্যপকহারে হ্রাস পেয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এ মাছের প্রজনন মৌসুম হলেও আগস্ট মাসে এরা বেশি ডিম দেয়। এ মাছটির কৃত্রিম প্রজনন কৌশল ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হওয়ায় এটি এখন চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে। বিলুপ্তপ্রায় তিত পুঁটি (*Pethia ticto*) এক সময় আমাদের দেশের হাওর- বাওড় নদী নালা, খাল বিলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে মাছটি খুবই জনপ্রিয় ছিলো। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষকরে নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, ভিটামিন, মিনারেল ও খনিজ লবণের চাহিদা এই মাছটির মাধ্যমে পূরণ হতো। মাছটির প্রজনন কাল মে থেকে আগস্ট, তবে সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস। একটি পরিপক্ব (৭-৯ গ্রাম) তিত পুঁটির ডিম ধারণ ক্ষমতা ১৬১০ থেকে ৪১৩০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় এ মাছটি এখন বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং বাণিজ্যিকভাবেও চাষ করা সম্ভব হবে। তিত পুঁটি

মাছের দাম অন্য মাছের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বহুল পরিচিত ও সুস্বাদু মাছ দারকিনা (*Esomus danricus*)। এ মাছটিও বিলুপ্তপ্রায়। ইতিমধ্যে দারকিনা মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও নারকেল চেলা, বটিয়া পুঁইয়াসহ অনেকগুলো মাছের কৃত্রিম প্রজনন উদ্ভাবন সম্ভব হওয়ায় এগুলোর চাষ শুরু হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে দেশীয় মাছের লাইফ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইফ জীন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ লাইফ জীন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাগনা, দেশী কই, খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সরপুঁটি, পুঁটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি, টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুঁইয়া, গুতুম,টাকি,ঢেলা, চেলা,পিয়ালি, দারকিনা, বাচা,বাতাসিসহ মোট ১০২ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকৃতিতে কোনো মাছ হারিয়ে গেলেও এই ব্যাংকের মাছকে ব্যবহার করে পুনরায় প্রকৃতিতে এই মাছ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

দেশে কম বেশি ১৩ লাখের মতো দিঘি, পুকুর, খাল বিলসহ উন্মুক্ত জলাশয় রয়েছে। এসব জলাশয়ে সনাতন পদ্ধতিতে মাছের চাষ হওয়ায় উৎপাদন কম হয়। অথচ পরিকল্পিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ করা হলে কয়েকগুণ বেশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাথে সাথে আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য অধিক হারে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে অধিকাংশই ছোট মাছ। ছোটো মাছের সুবিধা হলো এসব মাছে ভিটামিন-এ ও ডি,ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ও আয়োডিন থাকে। যার ফলে মানবদেহের হাড়,দাঁত, চর্মরোগসহ রক্তশূণ্যতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশে প্রতিবছর কম বেশি ৩০ হাজার শিশু রাতকাণা রোগে আক্রান্ত হয়। এটি আয়োডিনের অভাবে হয়। ছোটো মাছে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে ফলে নিয়মিত ছোটো মাছ খেলে রাতকাণা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দেশের মৎস্যসম্পদ খাতে সমৃদ্ধির সূচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সরকারের মৎস্যবান্ধব নীতি গ্রহণ ও চাহিদাভিত্তিক টেকসই কারিগরি পরিসেবা প্রদানের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৭.৫৯ লাখ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বপরিমন্ডলে স্বীকৃত। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫০ টিরও অধিক দেশে মৎস্য রপ্তানি করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪ হাজার ৪২ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করে ৫ হাজার ১৯১ কোটিরও বেশি টাকা আয় করছে। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপি ৩.৫৭ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। এখাতে অব্যাহত উন্নয়ন আমাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যা ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করেছে।

#

পিআইডি ফিচার